গৌরচন্দ্রিকা

গৌরচন্দ্রিকা

আজ রাখী বন্ধনের শুভ অবসরে ভারতমাতাকে আবর জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর তাগিদে দেশভক্তদের স্বদেশ মন্ত্রে পুনরায় দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (W.T.O.) নাগপাশ থেকে দেশ মাতৃকাকে সুরক্ষিত, স্বাবলম্বী স্বাভিমানী করতে তথা "ক্ষুধামুক্ত, নেশামুক্ত, শিক্ষাযুক্ত, স্বাস্থ্যযুক্ত" সমাজ গড়তে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের এই আহ্বান। কেন্দ্র ও প্রদেশ সরকারগুলির জনবিরোধী আর্থিক নীতিগুলি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দুস্পরিণাম সম্বন্ধে দেশের কোণে কোণে প্রভাবী প্রচারের জন্য গত ১৪ই এপ্রিল '০৩ থেকে ১৪ই জুন '০৩ পর্য্যন্ত সারা ভারতব্যাপী দিল্লী থেকে যে স্বদেশী সংঘর্ষ যাত্রার শুভারম্ভ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় দত্তোপন্থ ঠেংড়িজীর করকমলে হয়েছিল। তারই অঙ্গ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে ১৮ই মে'০৩ থেকে ২রা জুন'০৩ পর্যন্ত ১৭টি জেলায় স্বদেশী সংঘর্ষ যাত্রার রথ প্রায় ৩০০০ কিমি. পথ, ১০২টি শহর, প্রায় ২০০০ গ্রাম ও কলিকাতা হাওড়া মহানগরের প্রায় ৭২টি ওয়ার্ডে পরিক্রমা করেছে। এসমস্ত স্থানে প্রায় ২লক্ষ হ্যাণ্ডবিল সহ ১৪১টি পথসভার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে বার্তা পৌঁছেছি। কলিকাতার দক্ষিণেশ্বরে মাঃ রনেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পূজো দিয়ে বিকাল ৫টায় শ্যামবাজারে উদ্বোধন করেন মাঃ গোবিন্দাচারিয়া।

গত ২রা জুন কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে রথযাত্রার সমারোপ কার্যক্রমে বোফর্সখ্যাত শ্রদ্ধেয় এস. গুরুমূর্ত্তি জ্ঞানগর্ভ ভাষণে "নুতন দিশা ও নুতন আলোক বর্তিকা স্বরূপ ভারতকে মহাশক্তি হতে গেলে স্বদেশীয়ানার পথ ছাড়া বিকল্প নাই" বলে উল্লেখ করেন। সেই ইংরাজী ভাষণের অনুবাদক মাননীয় জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও সহযোগী সমস্ত দেবদুর্লভ কার্য্যকর্তাদের অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ অবদান স্মরণ করতেই এই নিবেদন।

বিনীত
নিবেদক
স্বরূপ চট্টোপাধ্যায়
দঃ বঙ্গ প্রান্ত সংযোজক

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমার অগ্রজ প্রতিম মাননীয় অধ্যাপক অলক ঘোষ, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সহযোগী শ্রীসরোজ মিত্র এবং কর্মক্ষেত্রে সহযোগী এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের শ্রী ধনপত আগরওয়াল, প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ।

বহুদিন পরে এখানে আসতে পেরে এবং কলকাতার সাধারণ মঞ্চে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি এবং স্বদেশী যাত্রার সমারোপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্বদেশী যাত্রা যে একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান সে কথা সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই যাত্রা দেশের বহু স্থানে সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কয়েকটি স্থানে হবে। এই কার্যক্রমের যখন আমরা পরিকল্পনা করি তখন আমাদের ইচ্ছে ছিল যে জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবহিত করা। যে পরিস্থিতির কী রকম পরিবর্তন হচ্ছে, WTO-র কী রূপ পরিণাম হবে, রাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুলি কীভাবে অনুসৃত হচ্ছে, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত শ্রেণী তৎপর রয়েছে, রাজনৈতিক, নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সংবাদ-মাধ্যমে কী ধরনের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এইসব বিষয়ে আমরা জন সাধারণকে অবহিত করার উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু যখনই আমরা এইসব বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছি, তখন জনসাধারণের দিক থেকেও আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করেছি এবং আমরা ভারতের ক্ষমতা, পুনরুত্থান ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আরো বেশী তথ্য জেনেছি।

ভারতের অর্থনীতির ধ্যান ধারণা পাশ্চাত্য অর্থনীতির ধ্যান-ধারণা থেকে অনেক ভিন্ন। আমাদের জনসাধারণকে আরো ভালভাবে বুঝতে হবে। আজ আমরা এমন এক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছি, যেখানে মনে হয় বিশ্ব চলেছে এক ভিন্ন পথে।

আমাদের বলা হয় যে আমেরিকা, কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। ভারত অন্য দিশা গ্রহণ করবে কেন?

দক্ষিণ দক্ষিণ কমিশন রিপোর্ট

তাদের সাফল্যের কারণ কী? বিশ্বায়ণ, বিশ্ব-বাণিজ্য, বিশ্ব পুঁজিনিবেশ, বিশ্ব-অর্থনীতি—এই সব ধারণাকেই গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে ভারতকে এবং আমাদের কাছে এইসব কাজই প্রত্যাশা করা হচ্ছে— এই ধ্যান-ধারণার দিকেই রাতারাতি আমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেবার প্রবণতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারতের সমাজতান্ত্রিক

প্রতিষ্ঠান রাতারাতি বিশ্বায়াণ ও উদারীকরণের প্রবক্তা হয়ে উঠেছে— এ ব্যাপারে সব থেকে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলেন ডঃ মনমোহন সিংহ, যিনি দক্ষিণ-দক্ষিণ কমিশন রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে পাশ্চাত্য আদর্শের অর্থনীতি এ দেশে চলবেনা, বাজার-অর্থনীতি এখানে অচল। অতএব আমাদের অর্থনীতির এক পৃথক আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। মাত্র এক বছর পরে তিনি নরসিংহরাও-এর মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী রূপে যোগ দিয়ে বিশ্বায়ণ ও উদারীকরণ নীতিকে কার্যকর করেছিলেন।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সমাজতান্ত্রিক পার্টি

একটু পিছনে ফিরে দেখা যাক্। আমি চেন্নাই থেকে এসেছিলাম, যেখানে ১৯৫৫ সালে AICC (All India Congress Commitee) এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে ভারত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে উন্নতির পথে চলবে। এই অধিবেশন চেন্নাই-এর আবাদি নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবাদি ঘোষণাপত্রে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করার শপথ গ্রহণ করা হয় - অন্ততঃ কংগ্রেস দলের দৃষ্টিতে। যেহেতু কংগ্রেস সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। অতএব এটাই নীতিতে পরিণত হয় এবং কয়েকটি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যার ফলে সরকার অর্থনীতির ব্যাপারে সব থেকে প্রভাবশালী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ভারতের সমস্ত অর্থনৈতিক অসুস্থতার একমাত্র সমাধান হিসাবে জাতীয়করণ (Nationalisation)কে তুলে ধরা হয়। জীবনবীমা, কয়লা, ব্যাংকিং প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই জাতীয় করণের নীতি প্রবর্তন করা হয়। উন্নয়ণের পথই হল জাতীয়করণ। ভারতীয় অর্থনীতির লাগাম এসে গেল সরকারের হাতে। এই ভাবেই ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা তৈরী করা হল। প্রথম দিকে পার্টির নীতিই হয়ে উঠল সরকারের নীতি। এমন কি ভারতের সংবিধানে ও সংশোধন করে ১৯৭৬ সালে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হল। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই ঘোষণা করতে বাধ্য করা হল যে সে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী, তা না হলে সেই রাজনৈতিক দলকে পঞ্জিকরণ (registration) করা হবে না। অতএব, এখন সি পি আই (এম) এবং বি জে পি-সহ সব রাজনৈতিক দলই সমাজতান্ত্রিক পার্টি হিসাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ভারতের সংবধিান - ব্যতীত ভারতে সমাজতন্ত্র নেই। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও সমাজতন্ত্রের নীতি নেই, তবু তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে ঘোষণা করেছে যে তারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সেই নীতিকে রূপায়িত করতে চায়। একটি রাষ্ট্র

হিসাবে আজ তাদের নীতি ও বাস্তবের মধ্যে কী বিরাট পার্থক্য! আমরা সমাজতন্ত্রের ধারণা ত্যাগ করে বাজার ভিত্তিক ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছি। প্রথম দিকে আমরা কোন বিতর্কে না গিয়ে সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছিলাম। আমি নিজে সমাজতন্ত্রের সমর্থক নই। আমি কখনই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করিনি। কারণ সমাজতন্ত্র ভারতের মহান (genious) ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বাস ও পরম্পরার সহিত সংগতিপূর্ণ নয়। অনুগ্রহ করে আমাকে সমাজতন্ত্রের সমর্থক বলে ভুল করবেন না। আমি শুধু ভারতীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে যে ভণ্ডামির প্রবেশ ঘটেছে, তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাজারজাত পুঁজিবাদীর ভিত্তিভূমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ

এইভাবে আমরা বিনা বিতর্কে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলাম — এই তন্ত্র ভারতের পক্ষে উপযুক্ত কিনা, সে বিষয়ে চিন্তা না করেই তার দিকে ঝুঁকেছিলাম। সেইভাবে বাজারের পুঁজিবাদ (capitalism)কেও আমরা কোন বিতর্ক ছাড়াই গ্রহণ করেছিলাম। আমরা বিচার-বিবেচনা করে দেখিনি যে এই পুঁজিবাদ ভারতের পক্ষে উপযুক্ত কিনা। যে সমস্ত দেশ বাজারী পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছে, তাদের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য কী? এবার আমরা বিচার করব যে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ এই দেশের জনসাধারণকে কী বোঝাতে চাইছে? ১৯৯১-৯২ সালে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ গঠিত হয়েছিল। ১৯৯১ থেকেই বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতি প্রচলিত হয়। ভারতীয় শিল্পের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, যাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় শিল্পের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যখন আমি তাঁদের স্বদেশীর কথা বলি এবং বোঝাই যে উন্নয়নের পাশ্চাত্য মডেল ভারতে কার্যকর হবে না এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত পুঁজিবাদ ভারতের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তখন তাঁরা আমাকে বলেছিলেন — 'আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে এমন অর্থহীন কথা বলছেন?' তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ১৯৯১-৯২ সালে সারা বিশ্ব যে কথা বিশ্বাস করেছে, আপনি বলছেন এই দেশে তা কার্যকর হবে না? অজ্ঞানতার দরুণই তাঁদের এরূপ অনুমান। আপনারা যদি সমগ্র বিশ্বকে একদিকে রাখেন এবং ভারতকে অন্য দিকে রাখেন, তাহলে দেখবেন, আপনি ভারতে যত বিবিধ বৈচিত্র্য দেখতে পাবেন, তা অন্য কোথাও পাবেন না। সমগ্র পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে ২৫০ ধরণের খাদ্য শস্য পাওয়া যায়, সেখানে এই দেশে আনুমানিক ৩৫,০০০ ধরণের পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রায় ২৫০০ ধরণের উদ্ভিদ পাওয়া যায়, সেখানে আমাদের দেশে অন্ততঃ ৮৫,০০০

ধরণের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, জীবন-যাপন পদ্ধতি ও এই দেশে বিপুল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। যে জীবন-যাপন পদ্ধতি অন্যান্য দেশে চলে, তা কি এই দেশে চলতে পারে? সে কথা বুদ্ধিজীবীরা, নীতি-নির্ধারকরা এবং সংবাদ-মাধ্যমগুলি কখনই বলেন না। যেহেতু একটি পদ্ধতি অন্যান্য দেশে প্রচলিত আছে, সেই কারণে এদেশেও তা চলবে, এই কথা অনুমান করে উদারীকরণ ও বিশ্বায়ন এখানেও গ্রহণ করা হয়।

ভারত কখনও একঘরে হতে পারে না

আমি বিশ্বাস করি না যে ভারতকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। ভারতকে কখনই বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ভারতের বাইরে প্রায় ১৪টি দেশে প্রায় ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) ভারতীয় বাস করেন। কোন সভ্য দেশ নিজ দেশের বাইরে এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পারেনি। যদি ধর নেওয়া যায় যে, একজন ভারতীয় বিদেশের পাঁচজনের সহিত সংযুক্ত, তাহলে অন্ততঃ দশ কোটি ভারতীয় ভারতের বাইরে সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। অতএব, ভারত প্রাকৃতিগতভাবে, সাংস্কৃতিগতভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে বহিবিশ্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত। অতএব, ভারত কখনো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আমি বিচ্ছিন্নতাবাদে বিশ্বাস করিনা। আমি বিশ্বায়নের বিরোধী নই। কিন্তু আজকের বিশ্বায়নকে আমরা স্বীকার করতে পারিনা। আমাদের এই বিশ্বায়নকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। আমাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে যে আমরা বিশ্বায়ন এবং পাশ্চাত্যকরণকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাদের জানাতে চাই যে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ কী করার প্রয়াস করছে। যে কথা আগেই বলেছি, পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ভিত্তি হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ। আমেরিকার দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যাবে যে আমেরিকার এক আদর্শ মডেলে পরিণত হয়েছে। আজ আমেরিকা অর্থনৈতিক, সামরিক, বৈজ্ঞানিক থেকে সব দিক থেকে শক্তিশালী দেশ রূপে উত্থিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ঐ দেশ সর্বাধিক স্বীকৃতি ও উন্নত দেশ রূপে গণ্য। এবং বিশ্বায়নের ধারণা অপরিহার্যরূপে বিশ্বের সম্বন্ধে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিস্তৃত হয়েছে। আমেরিকা যেন এক ধ্রুবতারা রূপে আবির্ভূত হয়েছে। আজ আমেরিকার ভিসা পাবার জন্য বিরাট সংখ্যক মানুষকে ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশের মার্কিন দূতাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আমেরিকা যেন এক অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের আমেরিকার

সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আমেরিকার জীবন-যাপন পদ্ধতি কি ভারতে প্রযোজ্য হতে পারে? আমেরিকায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এই পদ্ধতি এমনই সম্পূর্ণতা লাভ করেছে যে সেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিবারের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। পরিবার-তন্ত্র সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই গর্ভবতী, যাদের মধ্যে ৩৩% বালিকাই ১৪ বছরের কম-বয়সী। তারা স্কুলে যায় নিজেদের শিশু-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে এবং স্কুল সন্নিহিত শিশুশালা (Creçhe)-তে তাদের রেখে ক্লাসে যায়। শতকরা ৪৯টি শিশুই একক-অভিভাবকের অধীন, যাদের বাবা-মা একসঙ্গে বাস করেনা। পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই কারণে বেকার মানুষদের, প্রৌঢ় ব্যক্তিদের, রুগ্ন ও বৃদ্ধদের দেখাশোনা করার কেউ নেই। সেইজন্য এইসব মানুষদের বোঝা সরকারের কাঁধে এসে পড়েছে। বৃদ্ধ লোকদের পেন্সন, বেকার ভাতা ইত্যাদির জন্য আমেরিকার জি.ডি.পি-র ২৯% অর্থ আমেরিকার সরকারকে সামাজিক নিরাপত্তাখাতে খরচ করতে হয়। বস্তুতঃ বহু আমেরিকান অর্থনীতিবিদ্‌রা সরকারকে বলেছেন যে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে ২০১১ সালের মধ্যে আমেরিকার অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে যাবে। পরিবারের অস্তিত্ব না থাকায় কোন সঞ্চয়ও হয়না। সামাজিক নিরাপত্তার এই বোঝা সরকারের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পরিবারের অস্তিত্ব না থাকায় পিতা-মাতা অথবা পিতামহ-পিতামহীদের দেখা-শোনার কেউ নেই। পিতা তার বেকার পুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেনা। সে তার ভাই-বোনের শিক্ষার বা কন্যার বিবাহের দায়িত্ব নেয়না। সেই কারণে সঞ্চয়ের আদৌ কোন প্রেরণা নেই।

আমেরিকার মডেল

আমেরিকাতে যারা সঞ্চয় করে তারা ভারতীয়, চীনা অথবা মেক্সিক্যান। অন্যান্য ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ শূন্য। আমেরিকানরা যে শুধু সঞ্চয় করেনা তাই নয়, তারা দৈনন্দিন খরচের জন্যও ধার করে। বস্তুতঃ অধিকাংশ আমেরিকান আগামী বছরের বেতন থেকে ঋণ নিয়ে এই বছরেই তা খরচ করে ফেলেছে। আমেরিকার ২৮ কোটি লোকসংখ্যার মধ্যে ১৬ কোটি সক্রিয় কর্মীর কাছে ৭২ কোটি ক্রেডিট কার্ড আছে। আমেরিকান পরিবারগুলি নিজ দেশের ব্যাংকগুলি থেকে ৯০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নেয়। এই পরিমাণ ভারতের GDP থেকে ৪.৫ গুণ বেশী। এই পরিমাণ ১.৯ ট্রিলিয়ন ডলারের সমান। ওরা ঋণ নিয়ে সব খরচ করে ফেলেছে। আমেরিকান ব্যাংকগুলির কাছে আমেরিকান অর্থ নেই। আমেরিকার রাজ্য সরকারগুলি ঋণ নেয়।

আমেরিকার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ঋণ নেয়। পরিবারগুলিও ঋণ নেয়। কোথা থেকে তারা ঋণ নেয়? তারা অন্যান্য দেশ থেকেও ঋণ নেয়, যার পরিমাণ ছয় ট্রিলিয়ন ডলারের সমান। ওরা ঋণ করে এই কারণে যে ওদের পরিবার নামক কিছু নেই, তাই সঞ্চয়ও নেই। আমেরিকা যে পরিমাণ ঋণ নিয়েছে। তা পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশ যা মোট ঋণ নিয়েছে তার দশগুণ বেশী।

ব্যয় নির্ভর অর্থনীতি

বস্তুতঃ আজ আমেরিকাকে প্রতিদিন ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিতে হয় তাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তা না হলে আমেরিকান সরকার তার কর্মচারীদের বেতন দিতে পারেনা। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ আমেরিকার চেয়ারম্যান অ্যালেন গ্রীন স্প্যান বলেন, এ অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি। কেউ কি এই অবস্থার কথা জানে? কারা আমেরিকাকে ঋণ দেয়? জাপান ও চীন প্রধানতঃ আমেরিকাকে ঋণ দেয়। এই দুইটি দেশ ছাড়া আর কোন দেশ ঋণ দেয় আমেরিকাকে? তৃতীয় দেশ হচ্ছে ভারত আমেরিকাকে ৭৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। এর পরিমাণ প্রায় ৩৫০ লক্ষ কোটি টাকা। এই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রায় ভারত আমেরিকান সিকুইরিটিতে জমা রেখেছে। অথচ আমেরিকা ভারতে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছে তা মাত্র ১৫ বিলিয়ন ডলার—আর তাও কারখানা, শেয়ার ও পরিসম্পদ (Assets)-এর আকারে। অতএব, আমেরিকা যে পরিমাণ অর্থ ভারতে বিনিয়োগ করেছে, তার ভারত কর্তৃক আমেরিকায় বিনিয়োগ করা অর্থের এক-পঞ্চমাংশ ($\frac{1}{5}$th) এবং আমেরিকাকে দেওয়া ৭৫ বিলিয়ন ডলার সবই তারা খরচ করে ফেলেছে, তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমাদের হাতে আছে শুধু লিখিত চুক্তিপত্র (Pro-notes)।

পরিবারই ভারতীয় অর্থনীতির পরিচালনা শক্তি

এ হল ব্যয়ভিত্তিক অর্থনীতি (Consumption driven economy)-যে পরিবারগুলি দেউলিয়া, কিন্তু কর্পোরেশনগুলি মজবুত এবং এই হল আমেরিকান অর্থনীতির ভিত্তি যা একাধারে দুর্বল ও ছিদ্রবিশিষ্ট। ভারতের অবস্থা ওদের ঠিক বিপরীত। আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতিতে মোট বার্ষিক সঞ্চয় হল আনুমানিক চার লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে চার লক্ষ কোটি টাকা পাওয়া যায় পরিবারগুলির কাছ থেকে। এই পরিবারই হল সঞ্চয়ের ইঞ্জিন বিনিয়োগের ইঞ্জিন—

অর্থাৎ—ভারতের অর্থনৈতিক পরিচালিকা শক্তি। পরিবারকে বাদ দিলে ভারতীয় অর্থনীতি বলে কিছু নেই। আপনি ব্যাংকে টাকা জমা দেন EPF, PF রূপে প্রাপ্ত অর্থ। ব্যাংক সেই টাকা শিল্পে, ব্যবসায়ে এবং সরকারকে দেয়। অতএব, ভারতের সঞ্চিত অর্থই ভারতের যাবতীয় ব্যয়ভার ও বিনিয়োগের অর্থ বহন করে। ভারতের বার্ষিক বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ হল ১৪ হাজার কোটি, যে পরিমাণ ধনপৎজীর হিসাবে আমেরিকান ডলারে ৩ বিলিয়ন। কিন্তু আমরা শুধু বৈদেশিক বিনিয়োগের কথা বলব। আমাদের সংবাদ-মাধ্যম, রাজনৈতিক দলগুলি, আমলাতন্ত্র ও পণ্ডিতবর্গ শুধু বিদেশী বিনিয়োগের কথা বলবেন, যা ভারতে মোট বিনিয়োগের মাত্র ২ শতাংশ। লোকের মনে বিদেশী নির্ভরতা বাসা বেঁধেছে। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এই দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হয় তার কথা ভারতে কারো মনে পড়েনা। ভারতে এত অর্থ উৎপন্ন হয় কেমন করে? পরিবারের মাধ্যমে।

সামাজিক নিরাপত্তাই হ'ল ভারতের স্বতন্ত্র্যতা

ভারতকে যদি আমেরিকার মত উন্নতি করতে হয়, তাহলে ভারতকে কী করতে হবে? উত্তরটা সোজা। পরিবারগুলিকে অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং কর্পোরেশনগুলির কাছে অর্থ দিতে হবে—সে কর্পোরেশনগুলি ভারতীয় হোক বা বিদেশী। যদি আপনি প্রতি বছর এই অর্থ দেন অর্থাৎ বছরে ৪ লক্ষ কোটি, তাহলে কর্পোরেশনগুলি বিশাল প্রকল্প গড়ে তুলবে, পরিকাঠামো তৈরী করবে বিরাট-বিরাট ভবন। রাস্তা, বন্দর তৈরী করবে এবং আপনার দেশের উন্নতি হবে। কিন্তু পরিবার দরিদ্র হয়ে উঠবে। পরিবার থেকে অর্থ কর্পোরেশনগুলিতে ঢালা হবে উপভোক্তাবাদ (Consumerism)-এর সাহায্যে। পরিবারকে দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সেই ধরনের সস্তা পুঁজির সৃষ্টি হবে না, কারণ পরিবারগুলি উপযুক্ত সুদ ব্যতীত টাকা হস্তান্তর করবে না। এর ফলে ইকুইটি মার্কেটের দর বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে মানুষকে দরিদ্র করে কর্পোরেশনগুলি ধনী হয়ে উঠবে। এই হল আমেরিকান ও পাশ্চাত্য অর্থনীতির পদ্ধতি।

এবং যে সব অর্থনীতি ভারসাম্য রক্ষা করতে চায় তাদের জানা উচিত যে পরিবারগুলি কখনই চাইবেনা যে তাদের অর্থ কর্পোরেশন বা কন্‌জিউমারিজ্‌ম কর্তৃক গৃহীত হোক। সে ক্ষেত্রে আপনাকে উন্নয়নের গড়-পড়তা মাত্রাকে মেনে নিতে হবে। তখন আপনি উন্নয়নের অতি উচ্চ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করতে পারবেন না। এ হল সোজা অঙ্ক। যেহেতু পরিবার নামক সংস্থাটি এত মজবুত। আমেরিকার অবস্থা সেরকম নয়। সেখানে পরিবার নেই। বড়দের বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেখা-শোনা করার

কেউ নেই বেকারদের দেখার কেউ নেই। যে কথা আগেই বলেছি সেখানে ৪৯% শিশুদের একজন মাত্র অভিভাবক। এই একক অভিভাবকত্ব (Single-parent) শিশুদের জন্য সরকারকে ভাতা দিতে হয়।

আমি একজন ব্রিটিশ সরকারের উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বাংলা থেকে ইংল্যাণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন মার্গারেট থ্যাচারের ব্যক্তিগত কার্যসূচীর (Privatisation Programme) উপদেষ্টা রূপে কাজ করছিলেন। একদিন আলোচনার সময় তিনি বললেন, "গুরু, ভারতে যত কাজ হচ্ছে, সেগুলি বেসরকারীকরণ (privatised) হওয়া উচিত।" আমি বললাম, "হ্যাঁ"। কিন্তু আমি তাঁকে একটি প্রশ্ন করলাম, "সারা বিশ্বে সব থেকে বেসরকারীকরণ অর্থনীতি (Privatised economy) কী? তিনি আমার প্রশ্ন বুঝতে পারলেন না। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—মনে করুন, সরকার পরিবহন চালাচ্ছে, পৌরসভা চালাচ্ছে, পেট্রোল পাম্প চালাচ্ছে ইত্যাদি—যে ব্যবসায়গুলি ব্যবসায়ীদের চালানো উচিত। এই হল বেসরকারী করণ (Privatisation) -এর ধারণা। এইগুলি সরকারের উপর বোঝা। তাই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে "পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সরকারের উপর সব থেকে বেশী অর্থনৈতিক বোঝা কী?" তিনি বললেন, "সামাজিক সুরক্ষা।" আমেরিকাতে সামাজিক সুরক্ষা (GDP)-র ৩০%। ইংল্যাণ্ডে ৩৮%, জার্মানীতে ৫৬%, ফ্রান্সে ৪৯%, এবং সুইডেনে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ৬৫%। কেন? সুইডেনের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী মানুষ বিবাহ করেনা। যে কোন নারী যে কোন পুরুষের সঙ্গে যতদিন খুশি বাস করতে পারে এবং যত খুশিসহ শিশুর জন্ম দিতে পারে, শিশুদের কোন পিতা থাকবে না। এই ভাবে ৬৮ শতাংশ শিশুই অবৈধভাবে জন্মায়, নারী পুরুষের বিবাহ ছাড়াই এদের জন্ম হয়। গত বছর সুইডিশ সরকার একটি আইন প্রণয়ন করেছে যে ৬০ বছরের তদূর্ধ বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি বৃদ্ধদের দেখাশুনা করার জন্য একজন কেরানী নিযুক্ত করতে পারবে, তার বেতন দেবে সরকার।

পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার দরুন সামাজিক সুরক্ষার এই বোঝা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমার বন্ধুকে আমি বললাম যে আমাদের দেশে সামাজিক সুরক্ষার বেসরকারীকরণ (Privatised) আছে। পরিবারই এই বোঝা বহন করে। আইনের দ্বারা এটা বেসরকারীকরণ (Privatised) হয়না। আমাদের ধর্মের প্রাচীন নীতি অনুসারেই এই প্রথা বেসরকারীকরণ (Privatised) আছে। কেউ এটাকে অর্থনৈতিক বোঝা বলে মনে করেনা। আমি আমার মাতা-পিতার যত্ন ও পরিচর্যা করি। আমি আমার ভাই-বোনের শিক্ষার ব্যবস্থা করি এবং তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করি। কেউই

এটাকে আর্থিক বোঝা বলে মনে করে না। ছেলে-মেয়েরা যতক্ষণ উপার্জন করতে সক্ষম নয়, ততদিন তাদের দেখাশোনা করাটাকে কেউই অর্থনৈতিক বোঝা বলে মনে করেনা। তখন তিনি বললেন, "গুরু, এই ব্যাপারটা আমি কখনো কল্পনাই করতে পারিনি।" যে সময় আমরা আলোচনা করছিলাম, তখন দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং দুজন আমলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "সামাজিক সুরক্ষার দরুন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশেরই আর্থিক ভারসাম্য ব্যবস্থা এত (balance sheet) দুর্বল। কিন্তু ভারতের সমাজ-সুরক্ষায় এই একটি তথ্য যদি বিশ্বের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়। তাহলে ভারত সরকারের আর্থিক ভারসাম্য (balance sheet) যে কোন পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে অধিক সুস্থ বলে গণ্য হবে। এটাই হল ভারতের শক্তি। পরিবার-ভিত্তিক সমাজগুলির জমি অনেক শক্ত। যে সমাজগুলিতে পরিবার-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং ব্যক্তি-সত্তা অধিক গুরুত্বলাভ করেছে। তারা ভিন্ন শ্রেণীর সমাজ। বাজারভিত্তিক পুঁজিবাদ (Market Capitalism) সেই সমস্ত দেশেই উপযুক্ত যেসব দেশে পরিবার ও যৌথ জীবন বা (community) গুলির অধঃপতন ঘটেছে। সেসব দেশে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ বা (individualism)-ই হল মাপদণ্ড। সেই কারণে জাপানে কোন বাজারভিত্তিক পুঁজিবাদ (market capitalism) নেই। তারা বলে সমাজভিত্তিক পুঁজিবাদ (communitarism capitalism)। একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ দেখুন। আমেরিকার সঙ্গে বিরাট বাণিজ্যের কারণে জাপানের অর্থনীতিও ঐ পথে চলেছিল। উদারনীতি ও বিশ্বায়ন পর্যন্ত তারা খুব ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ১৯৯১ সালে জাপানী অর্থনীতি দুর্বল হতে শুরু করে। কারণ আমেরিকা আর জাপানের একমাত্র গ্রাহক রইল না। আমেরিকা অন্যান্য দেশ থেকে কেনা-কাটা আরম্ভ করে দিয়েছিল।

জাপানে বাজারভিত্তিক পুঁজিবাদ নেই

আজ জাপানের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন ডলার। জাপানের পোস্টাল সঞ্চয় একারই ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। জাপানীরা সঞ্চয় করতে পারে কারণ তাদের অর্থনীতি পরিবার-ভিত্তিক।

আমেরিকানরা পরামর্শ দিল যে তোমাদের অর্থনীতিকে যদি দুর্বল করতে না চাও, তাহলে তোমরা সঞ্চয় করা বন্ধ কর এবং খরচ করাশুরু কর। জাপানীরা আগে খরচের ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিল না। তাদের খরচ করার জন্য উৎসাহিত করার পর জাপান সরকার তাদের অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে খরচ করতে শুরু করে এবং

এরকম করতে গিয়ে জাপানের সরকার কোটি-কোটি ডলার জাপানী জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে খরচ করতে আরম্ভ করে। ওরা সড়ক, বিমান-বন্দর, সেতু, বিদ্যুৎ স্টেশন খরচ করতে আরম্ভ করে। ওরা সড়ক, বিমান-বন্দর, সেতু, বিদ্যুৎ স্টেশন তৈরী করতে থাকে। কিন্তু সেগুলি পূর্ণ সদ্ব্যবহার না হওয়ায় জাপানী অর্থনীতির আরো দ্রুত পতন আরম্ভ হয়। তখন পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ্‌রা বলে জাপানী সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং আরও অর্থ-ব্যয় করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। জাপানী জনসাধারণকে অর্থ-ব্যয় করতে প্ররোচিত করতে হবে। তার জন্য তারা নানা ধান্দা শুরু করে। তারা পরামর্শ দিলেন যে জনসাধারণ যাতে খরচ করতে বাধ্য হয়, তার জন্য সুদের হার কমিয়ে ৫% করা হল। তা সত্ত্বেও জাপানীরা খরচ করার দিকে ঝুঁকলনা, তখন সুদের হার আরো কম করে চার শতাংশ করা হল তারপর ৩% ও ০% করা হল। তবু জাপানীরা খরচ করলনা। তখন সরকার বলল, যদি তোমরা ব্যাংকে টাকা জমা রাখ, তাহলে ব্যাংককে টাকা দিতে হবে। তবু জাপানীরা খরচের পথে পা বাড়াল না। কারণ জাপানের অর্থনীতি পরিবার ভিত্তিক। পরিবার-ভিত্তিক অর্থনীতির নিজস্ব অনুশাসন আছে। যে সব দেশে পরিবারের অস্তিত্ব নেই, সেখানে অনুশাসনকে পবিত্র মনে করা হয়না। ভারতের মডেল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়, উপরের দিকে দুর্বল। আমেরিকান অর্থনীতির কোন ভিত্তি নেই, ওরা উপরের দিকে খুব মজবুত। ভারতীয় অর্থনীতি প্রচণ্ড সম্ভাবনাপূর্ণ। আমরা যখন স্বদেশীয় কাজ শুরু করি, তখন ভারতের ক্ষমতা বা দক্ষতা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতাম না। এবিষয়ে আমার প্রথম চোখ খুলে গেল যখন ১৯৯৩ সালে আমি লুধিয়ানায় গেলাম। সেখানকার শিল্প-উৎকর্ষ দেখে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেখানে যারা শিল্প-উদ্যোগ শুরু করেছিল, তারা খুব উচ্চশিক্ষিত ছিল না, ওরা কখনই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়াশুনা করেনি। কিন্তু তারা বিশ্বমানের মেশিন টুল্‌স তৈরী করছিল। হীরো সাইকেল হল রামগড়িয়া সম্প্রদায়ের উৎপাদন, যাতারা পরম্পরাগতভাবেই কারিগর শ্রেণীর মানুষ। তারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক সাইকেল উৎপাদন করত। বিরাট সংখ্যক বহুজাতিক কোম্পানী (MNC)-দের লুধিয়ানাই সাইকেলের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে। জলন্ধরে গিয়েও একই অভিজ্ঞতা হল বাটালাতেও একই কাহিনী। আমি রাজকোট ও মোরভিতেও একই দৃশ্য দেখলাম। গত দশ বছরে সুরাট প্রতি বছর এক লক্ষ কর্মসংস্থান করে। সৌরাষ্ট্রের লোকেরা গ্রীষ্মকালে সুরাটে যেত, কারণ সৌরাষ্ট্রে জলাভাব দেখা যেত। সেখানে তারা ৩-৪ মাস থাকত। কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের ছিলনা। সেখানে তারা

হীরে কাটতে শিখল। আজ সৌরাষ্ট্রে বিশ্বের সব থেকে বেশী হীরে কাটার কাজ হয়। অথচ কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জন্য এই কাজ হয়নি। ১৯৬৫তে কোনার বাঁধ বিধ্বস্ত হওয়ায় ঐ অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। সম্প্রতি ভূমিকম্পে আবার বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতির প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। আমি সারা দেশ পরিভ্রমণ করে ৪১টি শিল্প-গুচ্ছ আবিষ্কার করি। যার মধ্যে থিরুপুরও আছে। সেখানে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ—মাত্র ৩০০ পরিবার বছরে ৫০০০ কোটি টাকার বস্ত্র রপ্তানী করে। তাদের মধ্যে শতকরা ৯০% ইংরাজী জানেনা। এটা বাস্তবিকই বিরাট আবিষ্কার। আপনারা যদি ভারতীয় অর্থনীতির বর্ণচ্ছটায় বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখবেন যে মাত্র ১৩% GDP উৎপাদন করে কর্পোরেট সেক্টর, ২২% সরকার, ৩৬% কৃষি এবং ২৯% নন্ কর্পোরেট সেক্টর। কর্পোরেট সেক্টরের ১৩% এর মাত্র ২%-এর স্টক-এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। এইভাবে ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমরা শুধু সামান্য ভগ্নাংশের কথাই জানি। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী অরুণ জেটলি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি আশ্চর্যের সঙ্গে দেখেন ভারতে এমন ৭০টি শিল্প-কেন্দ্র আছে, যাতে সরকার এক টাকাও লগ্নী করেনি, সেগুলি সাধারণ মানুষ নিজ চেষ্টায় গড়ে তুলেছে। এগুলি বেচে ভারত ৭০,০০০ কোটি টাকার দ্রব্য প্রতি বছর রপ্তানি করে। কি বিশাল ক্ষমতা।

ভারতীয় অর্থনীতির সুরক্ষা কবচ

ভারত সরকারের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে (২০০২ অক্টোবর) জানা যায় যে অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রায় ৩.৫ কোটি ইউনিট এমন আছে যারা কৃষি-কার্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, তারা ৮.৫% মানুষকে কাজে নিযুক্ত করে সরকারের কাছ থেকে ১.৫% বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছে এবং বাকি বিনিয়োগ করেছে জনসাধারণ। আত্ম-নির্ভরতার এই ক্ষমতা বিস্ময়কর।

পরিসংখ্যান দেখলে জানা যায় যে বেশী শিক্ষিত লোকেরা অধিক সংখ্যায় বেকার। যারা ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেনি, তারা কম-সংখ্যায় বেকার, কিন্তু ডিগ্রী-ধারীরা বেশী সংখ্যায় বেকার। এর কারণ হল এই যে আমরা এমন মানুষ তৈরী করেছি যাদের কোন দক্ষতা নেই এবং তারা কাজের অনুপযুক্ত। মুম্বাই, কোলকাতা, চেন্নাই ও দিল্লীতে বহু শিক্ষিত মানুষই বেকার। জ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা এবং কারিগরী-ভিত্তিক শিক্ষা হল দুইটি ভিন্ন জিনিষ। লুধিয়ানাতে দেখুন কারখানার পর কারখানায় সাইনবোর্ড টাঙানো আছে যে "কাজের জন্য লোক চাই।" শিবকাশী, থিরুপর,

নামাকালে যান, যেগুলি কাজের কেন্দ্র। শিক্ষা-পদ্ধতি মালিক (কর্মদাতা) তৈরী করে না, (কর্মপ্রার্থী) শ্রমিক ও কর্মচারী সৃষ্টি করে।

দু বছর পূর্বে আমি কোডাইকানালে গিয়েছিলাম। সেখানে রোটারী ক্লাবে (রোটারঅ্যাক্টে) প্রায় ১৫০ জন ছাত্রের সঙ্গে আমি কথা বলি। তাদের মধ্যে ৫০জন ছাত্রীও ছিল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে তারা জীবনে কী করতে চায়। ১৫০ জনের মধ্যে ৫০ জন বলে যে তারা ব্যবসা করতে চায়। আমি I.I.T এবং I.I.M.-এ দেখেছি। সেখানে ৫০০জনকে এই প্রশ্ন করলে ৫ জনও এমন ছাত্র পাওয়া যাবেনা যারা ব্যবসা করতে চায়। সেই কারণে আমি উল্লিখিত ৫০ জনকে জিজ্ঞেস করি যে তোমরা কোথা থেকে এসেছ। তারা বলে যে থিরুপুর, শিবাকাশী, রাজকোট, সুরাট ও লুধিয়ানা থেকে এসেছে। অর্থাৎ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তারা ব্যবসা করার প্রেরণা লাভ করেনি। এই প্রেরণা তারা পেয়েছে নিজেদের সমাজে যেখানে ব্যবসা করা পেশা। আমাকে ভারতীয় দেশম ইন্‌ষ্টিটিউট্ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস (ত্রীচু) (Bharatidesam Institute of Management Sciences, Trichu) বক্তৃতা করতে বলা হয়। যেটা ভারতের প্রধান পাঁচটি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের অন্যতম।

আমি সেখানে ডিসেম্বর মাসে গিয়েছিলাম এবং মার্চ মাসে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ডিরেক্টর আমাকে বললেন, "স্যার, আপনি অত্যন্ত শুভ দিনে এসেছেন। গত দুই দিন ক্যাম্পাস ইণ্টারভিউ সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের সমস্ত ছাত্রই কাজ পেয়েছে, যদিও পরীক্ষা হবে তিন মাস পরে। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে সব থেকে বেশী বেতন পাবে বছরে ১৮ লক্ষ টাকা এবং আপনি বিশ্বাস করবেননা মিঃ গুরুমূর্তি যে সব থেকে কম বেতন পাবে বছরে ছয় লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আমাদের ছাত্ররা সর্বনিম্ন মাসিক বেতন পাবে ৫০ হাজার টাকা। এর জন্য আমরা যথেষ্ট গর্বিত।" এই কথা ডিরেক্টর আমাকে বললেন। আমি তখন ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ফাইনাল পরীক্ষায় কত জন পরীক্ষা দেবেন? তিনি বললেন, ষাট জন। আমি বললাম যে, কত জন আবেদনকারীর মধ্যে থেকে আপনি এই ষাটজনকে বেছেছেন? তিনি বললেন, দশ হাজার আবেদনকারীর মধ্যে থেকে ৬০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করালাম যে এই ৬০ জনকে কারা চাকুরী দেবে?

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রমিক তৈরী হয় মালিক নয়

আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি মালিক (কর্মদাতা) তৈরী করে না। এইটা হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের মতে—আমাদের দেশের বিপুল

পরিমাণ যোগ্যতা ও সুযোগ আছে। আমরা শুধু সেই শক্তির বিষয় জ্ঞাত নই। আমি যখন একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে থিরুপুর সম্বন্ধে কথা বলছিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে আপনি থিরুপর সম্বন্ধে কথা বলছেন। থিরুপুরে কী হচ্ছে? একটি কেন্দ্র যেখান থেকে প্রতি বছর ৫,০০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানি হয়, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিছুই জানেননা। ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেরা ভারত চালাচ্ছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই একই শ্রেণীভুক্ত। একই অবস্থা পণ্ডিতদের, শিক্ষাবিদ্দের, অর্থনীতির জ্ঞাতাদের এবং সংবাদ-মাধ্যমের লোকদের। ইংরাজীশিক্ষিত জনসংখ্যা প্রায় ৬.৫ কোটি, যা ইংল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশী। তাদের নিজেদের উপরেই বিশ্বাস নেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আত্ম-বিশ্বাস উৎপন্ন করেনা।

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও অনেক সমস্যা আছে। আমেরিকার সমস্যা হল একক অভিভাবকের অধীন শিশুরা, অবিবাহিতা মায়েরা। আমেরিকা এমন সমস্যায় ভুগছে যে অধিকাংশ আমেরিকান মনে করে যে ২০২৫ সাল নাগাদ আমেরিকার দুর্বৃত্ত শ্রেণীর জনসংখ্যা হবে ২৫ মিলিয়ন, অর্থাৎ ২.৫ কোটি, যা আমেরিকার পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। এ হল আমেরিকার সমস্যা।

আমাদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ভারতে একটি সমস্যা

আমাদেরও অন্য সমস্যা আছে। আমেরিকানরা মনে করে এইগুলি তাদের সমস্যা হলেও গোটা আমেরিকাকে সমস্যা জর্জরিত দেশ বলে মনে করেনা। কিন্তু আমাদের ভারতে আছে দারিদ্র্যের সমস্যা, যদিও দেশ হিসাবে আমরা দরিদ্র নই। আমাদের দেশে অশিক্ষার সমস্যা আছে, কিন্তু আমাদের দেশ অশিক্ষিত রাষ্ট্র নয়। এইরকমই আমদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যে সমগ্র দেশকে বাধা ও সমস্যা বলে মনে করি।

আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন অর্থনীতির দুইটি পেপার ছিল। একটি আধুনিক অর্থনীতি, যাতে জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের উন্নতি এবং কেমন করে এই সব দেশ উন্নতি করেছে। এইগুলি ছিল উন্নয়ন বা বিকাশের মডেল। যাকে আমরা মন থেকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। অন্য পেপারটি ছিল ভারতীয় অর্থনীতির উপর। তার শীর্ষক ভারতীয় অর্থনীতি ছিলনা, সেটা ছিল ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ। যুবা-মস্তিষ্কে এই কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ভারতকে এক সমস্যার প্রতীক হিসাবে দেখানো হচ্ছে।

ভারত গরীব নয়   ব্র্যাণ্ড নামে গরীব

আমি একটি প্রচলিত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটা একটা টাইটান ঘড়ি। এই ঘড়ি তৈরী করেছে টাটারা। টাটা এই ঘড়ি তৈরী করে শুধু ভারতের জন্য নয়, বরং সারা পৃথিবীর জন্য এবং তারা ভারতে তৈরী একটি বিশ্বমানের জিনিষ তৈরী করতে সাফল্য লাভ করে। অভিজ্ঞতার দ্বারা তারা জেনেছিল যে সুইস ঘড়ি হল সব থেকে দামী ঘড়ি। মার্কেটিং এর ভাষায় তাকে বলা হল হাই এণ্ড মার্কেট (high end markets) জাপানী ঘড়িগুলি দামে সস্তা, তাকে বলা হত লো এণ্ড মার্কেট (Low end market)। এছাড়া একটি মিশ্র শ্রেণীও ছিল। তাদের কারিগরী দক্ষতা, অর্থ, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি সব তৈরী ছিল সেই কারণে টাটারা সিদ্ধান্ত নিল যে টাইটান ঘড়ি বিশ্বের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উপর আধিপত্য করবে। এটাকে একটা বিশ্ব মানের ব্র্যাণ্ডে পরিণত করতে হবে। এটা প্রথম ভারতীয় বহুজাতিক (MNC) কোম্পানী হবে যার বিক্রয়-জগতে সুনাম হবে। আপনি লণ্ডনের হিথ্‌রো বিমান বন্দরে যান, অথবা নিউইয়র্কের বিমান বন্দরে, আপনি বিভিন্ন দেশের ব্র্যাণ্ডনাম দেখতে পাবেন, কিন্তু ভারতের নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যেতনা, যতদিন না টাইটানের আবির্ভাব ঘটল। আপনারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিমান বন্দরে টাইটানের নাম দেখে গর্ববোধ করবেন।

সেই কারণে টাটারা এই ঘড়ি বিক্রয়ের উদ্যোগ নিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠল—এটা এক সুন্দর ঘড়ি, এর দামও প্রতিযোগিতামূলক, উৎকর্ষে চমৎকার। কিন্তু যখন বলা হল এটা ভারতে তৈরী, তখন অনেকের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। কেন একটা দরিদ্র, অশিক্ষিত, জঘন্য দেশ এমন সুন্দর ঘড়ি উৎপন্ন করতে পারে? যে দেশে নববিবাহিতা বধূদের পুড়িয়ে মারা হয় প্রতিদিন, যেখানে বর্ণবিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গা সব সময় লেগেই থাকে। এমন একটা সুন্দর জিনিষ কী করে উৎপাদন করতে পারে? ওরা বিশ্বাস করতে পারেনা। তাহলে আমরা বলবনা যে এই উৎকৃষ্ট ঘড়ি ভারতে তৈরী। এটা টাটার উৎপাদন বলে খ্যাত হল। সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগরী দক্ষতায় ভারতে নির্মিত। এর জন্য সাহসের প্রয়োজন যে ঘোষণা করা এই ঘড়ি ভারতে তৈরী। অর্থাৎ ভারত দরিদ্র নয়, কিন্তু ভারতের ব্র্যাণ্ড নেম হল দারিদ্রতা। এবং কারা ভারতকে দরিদ্র বলে বদনাম করল? ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা, ইংরাজী সংবাদ-মাধ্যম, আমাদের আমলারা, আমাদের রাজনীতিবিদ্‌রা। আমরাই ভারতকে নিচে নামিয়েছি, ভারতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছি, ভারতকে দরিদ্র বলে বিশ্বময় প্রচার করেছি। আমি আরও একটু এগিয়ে যেতে পারি। জেনেভাতে এক প্রদর্শনীতে ছোট-ছোট ঘড়ির প্রদর্শনী হয়। টাটারা সেখানে টাইটানের প্রদর্শনী করতে চাইল। কিন্তু সুইস্ লোকেরা ষড়যন্ত্র

করল যাতে টাইটানের প্রদর্শনী না হয়, কারণ টাইটানের মত শক্তিশালী প্রতিযোগী ভারত থেকে অংশ নিলে ওরা দাঁড়াতে পারবে না। সেই জন্য টাইটানকে জেনেভাতে প্রদর্শনীর জন্য জায়গা দেওয়া হলনা। তখন ভারত সরকার (Indian Trade Promotion Organisation-এর মাধ্যমে প্রদর্শনীর জন্য জায়গা চাইল। তখন প্রদর্শনীর আয়োজকরা অস্বীকার করতে পারল না। সরকার টাটাদের বলল যাতে ওরা প্রদর্শনী করে কিন্তু টাটারা প্রদর্শনী করতে অস্বীকার করল। ওরা ভারতের সঙ্গে নিজেদের নাম যুক্ত করতে চাইল না। আপনারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপর কী রকম চাপ আসে সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমরাই ভারতকে বদনাম করেছি, নিম্ন পর্যায়ে পর্যবসিত করেছি। সেই কারণেই ভারতীয় শিল্প এবং অর্থনীতি দুর্ভোগ ভোগ করছে। আমি নিজের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমি আটলাণ্টায় গিয়েছিলাম। আমেরিকায় থাকার সময় ১৯৯৩ সালে আমি কার্টার সেণ্টারে গিয়েছিলাম, কারণ কার্টার সেণ্টার প্যালেস্টাইনে সাফল্যের সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা করেছিল। আমি ভাবলাম, আমরা নির্বাচন-পরিচালনার ব্যাপারে খুবই দক্ষ, কেননা বুলেটের বর্ষার মধ্যেও পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যাণ্ড এবং মিজোরামে তার প্রমাণ রেখেছি। আমি জানতে গিয়েছিলাম কার্টার সেন্টার কীভাবে ঐ কাজ করেছে। আমি যখন গেলাম তখন জিমি কার্টার সেখানে ছিলেন না। তাঁর সেক্রেটারী আমাকে স্বাগত জানালেন এবং চা খাওয়ালেন। তারপর বললেন, "মিঃ গুরুমূর্তি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার কাছে আপনাকে দেবার মত কোন অর্থ নেই।" তাই শুনে আমি খুবই আহত বোধ করলাম। তখন আমি তাঁকে আমার আসার কারণ বললাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কী করে ভাবলেন যে আমি চাঁদা বা দান চাইতে এসেছি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে "আপনি প্রথম ভারতীয় যিনি চাঁদা বা দান চাইতে আসেননি।" যে লোকেরা আমেরিকায় চাঁদা চাইতে যান তাঁরা সাধারন লোক নন। তাঁরা ভারতের শিক্ষিত মানুষ। তাঁরা NGO পরিচালনা করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালান, দানছত্র চালান।

আমরা ভারতকে বিকৃত করছি

খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রচার করত যে ভারত এক জঘন্য দেশ। যদি ঐ দেশকে বাঁচাতে চান তাহলে আমাদের টাকা দিন। এইভাবে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে আমাদের নামে অপপ্রচার করা হত। আজও শিক্ষিত লোকেরা সেখানে গিয়ে ভিক্ষা করে। যে দেশ অর্থদান গ্রহণ করে তারা কখনও লক্ষ্মী আনতে পারেনা। আমরা কি এই

ব্যাপারটা বুঝতে ও তাকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম? এই সব কাজের জন্যই স্বদেশী বিভিন্ন দেশের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। ভারত শুধু সংঘাতকেই তুলে ধরেছে। আমি একটি কথার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যে বিষয়ে কারো নজর পড়েনি। সেটা হল আমাদের বাজেট। এই প্রথমবার ভারত সরকার একথা ঘোষণা করেছে যে তারা অন্যান্য দেশ থেকে দান গ্রহণ করবে না। এর ফলে ভারতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ভারতীয় বাণিজ্য ও রপ্তানি উৎসাহ লাভ করবে। আমাদের ভারতীয় মানসিকতাকে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার ফলে ভারতের উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে সম্মান লাভ করবে। স্বদেশী আন্দোলনের এটাই লক্ষ্য।

আপনারা যে ধৈর্য সহকারে একটি অত্যন্ত গুরু গম্ভীর ভাষণ শুনেছেন, তার জন্য আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস, আপনারা আপনাদের উপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তুলবেন এবং অন্যদেরও অনুরূপ করতে প্রেরিত করবেন। আমাদের নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।

মহর্ষি অরবিন্দ ও কুলস্বামী

আমি পণ্ডিচেরীতে মহর্ষি অরবিন্দের এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে আমার বক্তৃতা শেষ করব। মহর্ষি অরবিন্দ ঘণঘোর অন্ধকার থেকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজছিলেন। তিনি কুলাচা নামক এক অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিকের কাছ থেকে নির্দেশ পাবেন বলে আশা করেছিলেন। ঋষি অরবিন্দ তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে বসে চা পান করছিলেন। কুলস্বামী এলেন এবং চায়ের কাপ তুলে তা উল্টে ফেলে দিয়ে অরবিন্দকে দেখালেন এবং বেরিয়ে গেলেন। অরবিন্দ তাঁর সংকেত বুঝতে পারলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তখন তাঁর সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন যে কুলস্বামীকে এরকম কাণ্ড দেখেও তিনি এমন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কেন? অরবিন্দ তাঁদের বললেন যে "তিনি আজ আমাকে এমন উপদেশ দিলেন যার জন্য আমি গত দেড় বছর যাবৎ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে আমি যা কিছু ভাবছিলাম তা যেন ঝেড়ে ফেলে দিই ও নতুন করে ভাবতে শুরু করি।" আমিও আপনাদের শ্রী অরবিন্দের এই বাণী অনুসরণ করতে অনুরোধ করি।

ধন্যবাদ

প্রাচীন ভারত ও স্বাদেশীকতা

—মাননীয় গোবিন্দাচারীয়া

মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট মহানুভব আর এই সভাতে উপস্থিত সহযোগীগণ,

কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাপারে আমরা সবাই নিশ্চিত, তাতে কোন ভ্রম বা শংকা নেই। যেরকম "ব্যক্তি থেকে বড় সংগঠন, সংগঠন থেকে বড় দেশ" আমরা সবাই মেনে নিয়েছি।

আবার সবাই এও জানি "দেশ যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে কি কেউ বাঁচবে? দেশ থাকবে তাহলে শেষ হবে কারা?" এই আধারে সমাজের কাজ চলছে। অনেক রকম সংকটের মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলেছে। এখনকার সংকট বিশেষ ধরণের তথা আলাদা। বাইরের যেসব ধনী দেশ আছে তারা গরীব দেশকে লুটপাট করার জন্য নুতন নুতন পদ্ধতির উপায় বের করছে। ৫০০ বছর আগে সরাসরি এসে লুটপাট করত। ইউরোপের লোকেরা ৫০০ বছর আগে আমেরিকা গিয়েছিল। ওখানে যে ৩ কোটি লোক বাস করত তাদের সবাইকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছে। আর আজ আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা ওদের দ্বারা তৈরী হয়েছে। এরা সবাই ইউরোপ থেকে গেছে। ২০০ বছরে ইউরোপে জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। মানে ইউরোপ ছেড়ে আশ-পাশের দেশে বসবাস করতে লাগল। ঐ সময়ে ইউরোপের মতো আজকের ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড যেমন রাষ্ট্র আলাদা আলাদা আছে এরকম ছিলনা। পুরো ইউরোপ রাজত্ব যদি বলেন তাহলে সেখানে পোপের শাসন চলত। ঐ সময়ে পর্তুগাল ও স্পেন এরকমভাবে দখল করার জন্য আলাদা আলাদা স্থানে গেল। কেন গেল? কারণ ইউরোপে সব থেকে বেশী অরাজকতা চলছিল। কেন অরাজকতা চলছিল? কেন না ঐ সময়ে ইসলাম ও ইসাইদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। কখনও উত্তরের ইউরোপে মুসলীমরা কখনও দক্ষিণ ইউরোপে হামলা চালাত ইসাইয়েরা। জেহাদ্ ইসলামীদের মাধ্যমে আবার খ্রীষ্টীয়দের মাধ্যমে। এর ফলে এমন অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে লোকেদের মনে হ'ল তার থেকে বরং বিদেশে গিয়ে থাকি। যারা ইউরোপে কিছু করতে পারত না তাদের মধ্যে দাদাগিরি করা, মস্তান, অপরাধীরা ঐ শ্রেণীর লোক বাইরের দেশে উপনিবেশবাদী নামে গিয়েছে। স্পেন ও পর্তুগালের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হতে লাগল কে কোন দেশে যাবে। নিজেদের

মধ্যের ঝগড়া সমাধানের জন্য পোপের কাছে গেল আর পোপ এক সমাধান দিল। তাকে ইংরাজীতে ("Bull") "বুল" বলা হত। পোপের বুল ("Bull") মানে ঘোষণা। কি ঘোষণা? স্পেন যাবে পশ্চিম ইউরোপে এবং পর্তুগাল যাবে পূর্বে। এটা ঐ সময়কার ঘোষণা হয়ে গেল। এজন্য আপনারা দেখবেন মেক্সিকো, আর্জেণ্টিনা, পেরু এসব দেশে ওখানে স্পেনের অধিবাসীরা বেশী। মরক্কো প্রভৃতি দেশে পর্তুগালের লোক বেশী। স্পেনের লোকেরা বেশী আসেনি। অতঃপর ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড এদের মধ্যে ঝগড়ার কারণে এরা ভারতে আসতে শুরু করেন। ভারতীয় সমাজ ধনী সমৃদ্ধ তো ছিলই সাথে সাথে শক্তিশালী। তাই ভারতীয়দের পারল না মারতে যে রকম আমেরিকা কানাডাতে হত্যালীলা চালিয়েছিল ২০০ বছর ধরে। ফলে, আমেরিকা ৩ কোটির মধ্যে মাত্র ৬০,০০০ স্থানীয় অধিবাসী বেঁচে আছে। কিন্তু ভারতে পারলনা কারণ এরকম অনেক সহ্য করেছে লড়াই করেছে। তিনট আশ্চর্যজনক তথ্য সামনে এসেছে বিশ্বে মোট দুটি এমন সভ্যতা আছে ভারত আর চীন।

(ক) আমাদের সমাজ ৫০০০ বছরের বেশী পুরনো। রোমান, গ্রীক, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলোনীয়, মিশর, ইরাক যে কোনও সভ্যতা ২—২ $\frac{১}{২}$ হাজার বছরের বেশী নয়।

(খ) এমন কোনও সভ্যতা নেই যারা ৪০০ বছরের বেশী অত্যাচার সহ্য করেছে তথা বেঁচে আছে। সেক্ষেত্রে চীনেও এত বছর (চারশ) অত্যাচার হয়নি। ভারত এরকম নিশ্চিত দেশ যে ১০০০ বছর অত্যাচার মোকাবিলা করেছে। আজও রাম তথা কৃষ্ণের ব্যাপারে ভক্তি শ্রদ্ধা আছে যা ৫০০০ বছর আগে ছিল। আজ মিশর যেখানে পিরামিড আজও আছে। সেখানকার জনতার মধ্যে হৃদয়ের যোগ নেই। আরেকটি রোমাঞ্চকর তথ্য ১২৮০-১৭০৭ (মহম্মদ ঘোরী থেকে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত) ৪০০ বছরের মধ্যে। ইসলামের খবরদারি কেবল ৬০ বছর ছিল ভারতের অর্ধেক জায়গা দখলে ছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রোচক তথ্য হ'ল—ভারত সারা বিশ্বে আর্থিক দৃষ্টিতে এক নম্বর দেশ ছিল। ২০০ বছর আগেও ছিল। আমাদের কেউ কেউ মনে করেন যে আমরা পিছিয়ে পড়া গরীব দেশ। এমন কি ইউরোপের কৃষকের থেকে ভারতের-ভূমিহীন মজুরের খাদ্যে ১০০০ ক্যালরি তথা পুষ্টিগুণ (ক্যালরি ইনটেন্ট) অনেক বেশী। বাকী বড় সম্পদের কথা বলছি না। উদাহরণ ছিলই মাপদণ্ড যদি এই রাখি তাতেও আগে ছিলাম। ২০০ বছরে পিছিয়ে পড়েছি। পিছিয়ে থেকেও আজকেও

শিক্ষা জগতে পড়াশুনাতে ভারত বিশ্বের মধ্যে সবার আগে। কম্প্যুটার, সফট্ ওয়্যারকে তো বিশ্ব মেনে নিয়েছে যে ভারত আগে। কাপড়ের জগতে (Dying) ভারত আগে। হীরে জহরত জগতে ভারতের কাজ সবথেকে ভাল। এসব তথ্য যখন সামনে আনছি আর আজকের সংকট যখন দেখি তো বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি এই সংকট থেকে নিশ্চিতভাবে বেরোতে পারব। তা বলে সংকটকে কম করে দেখছি না। সে ব্যাপারে তো বলবই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস তো রাখি কি এ থেকে উদ্ধার পাবই। উদাহরণ দিচ্ছি—একটা বট গাছ ১৫০ বছর দাঁড়িয়েছিল। বর্ষাকালে জুলাই মাসে একটি লতা গাছ বটগাছকে জড়িয়ে ধরে উঁচুতে উঠতে থাকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে আরও এক হাত বেশী ঐ লতা বেড়ে গেল। এরপর নীচে ঝুঁকে বলে এই গাছ কি দাঁড়িয়ে আছ? আরে কবে থেকে দেখছি দাঁড়িয়ে আছ আরে কিছুতো ওঠো বড় হও। খুবই অলস তুমি, আরে কম সে কম আমার সমান হতে, খালি খালি দাঁড়িয়ে আছ। গাছ চুপচাপ, পুনরায় লতা বলছে—বলছ না কেন কিছু? কিছু তো বল। তখন বটগাছ বলল আমি ১৫০ বছর দাঁড়িয়ে আছি—এরমধ্যে ১২৩টি তোমার মত লতা আমাকে ধরে বড় হয়েছে আর বলেছে—আর আজ তুমি ১২৪ নম্বরে। জুলাই মাসে আসে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত থাকে ওরকম বলেও কিন্তু এপ্রিল মে মাসে ও মরে যায়। আমি তো যেমন কে তেমন দাঁড়িয়ে থাকি। ভারতেরও শক্তি এরকম বট গাছের মতো।

সিকন্দর এসেছিল। আমাদেরকে ভুল ইতিহাস সপ্তম শ্রেণীতে পড়ানো হয়েছিল যে পুরুর সাথে সিকন্দারের লড়াই হয়েছে। পুরুর কাছে হাতি ছিল, সিকন্দরের কাছে ঘোড়া ছিল। লড়াই হয়, বৃষ্টি হয়, কাদাতে হাতি ফেসে যায়, ঘোড়া দৌড়ায়, সিকন্দার সেজন্য লড়াই জিতে যায়। কিন্তু সত্যিটা কি! আরে ভাই ট্রেক্সট বুক কবে লেখা হয়েছে? ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে টেক্সট বুক লেখা শুরু হয়েছে। এর আগে ছিলনা। ১৮৯০তে কারা লিখেছে? ইংরেজরা শাসনে ছিল। পুরু হেরেছে সিকন্দার জিতেছে যদি ধরে নিই তাহলে সিকন্দরের ব্যাপারে সেখানকার লোকেরা কি লিখেছে? সিকন্দরের ফৌজ ভারত আসা পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গেছে কিন্তু সেনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে। তবুও দ্বিতীয় নদী পার করার পর আর আগে যেতে চাইল না কারণ মগধ থেকে লাখে লাখে হাতী বৃষ্টির মতো আসছে। এত হাতীর সাথে লড়াই করা অসম্ভব। তাই আমাদের মেরে ফেললেও আগে যাব না। সেনার মধ্যে বিদ্রোহ হ'ল। তখন সিকন্দর সিদ্ধান্ত নিল "অনেক হয়েছে এবার নিজের দেশে ফিরে চল"। কিন্তু যাওয়ার রাস্তায় হাতী থাকতে পারে

তাই অন্য রাস্তায় ফেরার সময় স্থানে স্থানে বাধা পায় এবং তীর লেগে সিকন্দারের মৃত্যু হয় তাই আলেকজান্দ্রীয় নামক স্থানে কবরের সমাধি দেখা যায়। এসব সিকন্দারের ইতিহাসকার লিখছে। আলেকজান্দ্রীয়াতে তার জন্ম হয়নি কিন্তু। আর আমরা কি পড়ছি? তাইএসব তথ্য যখন জানতে পারি তখন নির্ভরযোগ্য ভাবে এগোতে পারি। শক্ হুণ্ মোগল পাঠান এসেছে। ইসলামীরা দলের পর দল এসেছে। ইসলাম যুবকদের আক্রমণ লাগাতার চলছিল। কিন্তু সীমা পার করতে করতে নিস্তেজ হয়ে যেত।

এরপর একটি কথা—খ্রীষ্টানদের তখন খুবই জোর ছিল যেমন এখনও আছে। ইংরেজের প্রশাসনে তিনজন ছিল, যাদের ভারতকে স্থায়ী পরাধীন দেশ রাখার পেছনে অনেক বেশী অবদান ছিল। তার মধ্যে একজনের নাম শুনে থাকবেন যার নাম মেকলে। দুটো নাম আরও আছে একজন জন মিল্ক, অন্যের নাম উইলবার ফোর্স। জন মিল্কের কাজ ছিল ইতিহাস বদলানো, মেকলের কাজ ছিল শিক্ষা জগতে কাজ করা মস্তিষ্ক বদলানো। উইলবার ফোর্সের কাজ ছিল রাজসত্তার মাধ্যমে ধর্মান্তরণ বৃদ্ধি করা। আর ইসাই মিশনারীদের সাহায্য করা। এই কাজে প্রশাসনিক সহযোগীতা থাকে তার প্রচেষ্টা মিশনারীরা করত। কেবল তিনজন কাজ করত। যখন আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাতে করে ফেলেছে। উঃ আমেরিকা ইউরোপেও করে ফেলেছে। আচ্ছা, ইসা, মসীরা যখন ছিল না তখন ইউরোপের লোকেরা পূজার্চনা করত কিনা। পুজা তো করত। কি পূজা করত! ভয়ঙ্কর পশুর মাথা ও মানুষের শরীর মিলিয়ে দেবতা বানাতো। ঐ দেবতাকে রাজ মহলের মতো মন্দিরে রাখত। পূজা চলত। এক রাজা নাম কন্‌ষ্টান্‌টাইন্ পগান ধর্মের ছিল। ইসাই মিশনারীরা ইসাই বানিয়ে দিল। সেনারা সমস্ত পগান ধর্মের মন্দিরে দেবতার মূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেলে "ক্রস" লাগিয়ে দিল। "ক্রস চিহ্ন" বিখ্যাত হয়েছে। ৩৭৮ A.D. এর পরে। সারা ইউরোপ পগান ধর্মকে ইসাই বানিয়ে দেয়। আরে বাবা ভারতেও তো অনেক অত্যাচার চালিয়েছ এখানে হল না কেন? আমাদের সমাজে এক প্রকার অন্তর্মুখী শক্তি আছে—কি শক্তি? ওখানে ছিল ব্যক্তি, রাজ্য, ধর্ম, ধর্ম বড় রাজমহলে কিংবা পগান মন্দিরে। সেজন্য মন্দির ধ্বংস করে দিল পগান ধর্ম শেষ। আমাদের এখানেও তো করেছে, উদাঃ—মোতি দাস কে আড়াআড়ি কেটেছে এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই ছেলেকে দেওয়াল গেঁথে হত্যা করেছে। কি কি হয়নি সব রকমের অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু এখানে কি হয়েছে—কেবল বড় বড় মন্দিরে নয়। প্রত্যেক ঘরে ঘরে ব্রত, উপবাস, উৎষসব, অক্ষয় তৃতীয়া, সন্তোষী মাতার ব্রত, শনিবারের ব্রত, মঙ্গলবার, হনুমানজীর

ব্রত, সোমবার শিব এবং দেবীর শুক্রবার আরও কত হচ্ছে। ঘরে ঘরে হওয়ার ফলে পরিবার সংস্থাতে আরা বেঁচে আছি, টিকে আছি তথা এগিয়ে চলেছি।

তাই মার্ক্সবাদও খুব জোরে এসেছে আর এর প্রতিক্রিয়াতে বহু রাষ্ট্রীয় কোম্পানীর মাধ্যমে (WTO), পুঁজিবাদ, বাজারবাদ এসব এসেছে। এর থেকেও আমরা রক্ষা পাব। আমরা যদি টিকে থাকি নিজের জমিতে। কেমন করে? এরা তো অনেক ধোঁকা দেবে। ছল চাতুরি ছদ্মবেশ এর পদ্ধতি। ছল চাতুরিতে মানুষ অনেক সময় দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। যখন ১৯৯১তে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হয় তখন বলা হয়েছিল ভারতে স্বর্গ এসে যাবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হ'ল পুরো বিশ্বকে সমর্থ বানানোর মন্ত্র। অনেক বছর হয়ে গেল আর ১৯৯১এর পরও তো ১২ বছর কেটে গেল। দেশের কি হ'ল? বিশ্বের কি হয়েছে? উত্তর আসবে পুরো বিশ্বে আর্থিক অসমানতা বেড়েছে। গরীব দেশগুলিতে শাসনের দুই প্রকারের শোষণ হয়েছে। গরীব দেশের শতকরা আমদানীর গড় কমেছে। এসব আমি বলছি না। ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেণ্ট রিপোর্ট বলছে। ১৯৯২ সালের "ওয়াশিংটন কনশাসনেস" নামে দলিল তৈরী হয়েছে এই নিয়ম অনুসারে চলো তো সব ঠিক হয়ে যাবে। সবাইকে বলা হল। সেখানে পুনঃ পুঁজি বিনিয়োগ ও আছে। আরেকটি দিক বাইরের পুঁজি খুব নিয়ে এসো। যে চাষ করবে তাকে নয় যে উৎপাদন বাড়াবে তাকে জমি দিয়ে দাও। এসব কি নিয়ম আছে? কিন্তু ১৯৯২ সালের পর ১০ বছর হয়ে গেলেও ২০০২ সালে ওরাই বলছে একই নিয়মে সারা বিশ্ব এগিয়ে যেতে পারবে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রকারের সেজন্য আলাদা নিয়ম চালু হওয়া উচিত, আরে তোমরাই চালু করে তোমরাই নিয়ম বদলাচ্ছ। তাহলে তোমারও শাস্তি হওয়া উচিত কি না। জরিমানাও হওয়া উচিত। এরকম পরিস্থিতি বিগত ১০ বছরে তৈরী হয়েছে। কিন্তু ওরা ছল-চাতুরি খুব করে। অনেকবার আমরাও সংকটে, আশঙ্কায় দিক্ ভ্রান্ত হয়ে যাই. আর ভগবানও অনেক সময় এরকম মুশকিলে পড়েছেন। ভগবান রামচন্দ্র সীতা হরণের পর ভারতের দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে কেরলে পৌঁছান। ওখানে এক দিঘী আছে নাম পম্পা সরোবর। বিকেলে ঠাণ্ডা সুন্দর মনোরম পরিবেশে রামচন্দ্রের মনে হ'ল একটু বিশ্রাম করি। রামচন্দ্র উঁচু টিলার ওপর বসলেন আর লক্ষণ পাহারা দিতে লাগল। ইতিমধ্যে এক সাদা বক্ ধীরে ধীরে রামের পায়ের দিকে আসছে। তখন পাথরের টিলার নীচ থেকে শব্দ আসছে ব্যাঙ বলছে মহারাজ ও ধার্মীক নয় আমার বংশ নাশ করেছে কেবল আমি বেঁচে আছি। জল না নড়ে তাই ধীরে ধীরে পা ফেলে আসছে। সেরকম বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন বা আই এম

এফ্ হোক এরা দেখতে এরকম কি খুবই ধার্মীক তথা উপকারী লোক কিন্তু ওদের লক্ষ্য অন্য কিছু আছে। আর এরা কিছু দেয় কিন্তু বেশী নেয়। আমাদের দারিদ্রতা ঠিক করতে আসছে 'না' ওর যা প্রয়োজন ওটা নিতে আসছে।

উদাহরণ—আমার ৩-৪ বছরের ছোট বোন, একদিন স্কুল থেকে আসছি দেখি মা ওকে ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ললিপপরূপী লজেন্স ছোটবোন চুসছিল। মা ওকে ধরে বলল কোথা থেকে পেয়েছিস ? কে দিয়েছে? বোন বলে "একজন দোকানে দিয়েছে" সঙ্গে সঙ্গে মা এক চড় মারলেন। আমি বললাম কেন মারছেন? মা বললেন—কানে সোনার দুল ছিল নেই তার মানে ঐ লোকটাই লজেন্স দিয়ে ভুলিয়ে খুলে নিয়েছে। মা বললেন লজেন্স দিয়ে সোনার কুন্ডল নিয়ে নিল। ঠিক এরকম সমস্ত ব্যবসা তথা ধান্দা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার। এর উপকার করতে আসছে না! আমাদের মনে হচ্ছে উপকার করতে আসছে।

দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি—আপনাদের মনে থাকবে সরিষা তেল থেকে এক ড্রপসি নামে রোগ চলছিল না? রাজস্থানে কিছু অঞ্চলে সরষের ঘানি থেকে খোলা তেল বিক্রয় বন্ধ করা হয়েছিল। ফলে সরিষার চাষও বন্ধ। প্যাকেট তেল বাজারে এসে গেল। প্যাকেজিং শিল্প বেড়ে গেল। কিন্তু গত বছর রিপোর্ট ঐ 'ড্রপসি' রোগ ঐ তেল খেয়ে হয়নি। এ হ'ল চালাকি।

আরেকটি আপনাদের জানা আছে আয়োডাইজড্ লবণের কথা। সারা ভারতে ৬০০০০ কোটি টাকার লবণ খায়। ১০ কোটি টাকার আয়োডিনযুক্ত লবণ মেশানো হয়। প্যাকেজিং, বিজ্ঞাপনে ঝর ঝর করে লবণ পড়ছে দেখায়। Turn Over ৬০০০০ কোটি টাকা খরচ হয়। সারা বছর এই পরিমাণ টাকা বড় বড় উদ্যোগপতি টাটার মতো লোকেদের পকেটে ঢুকছে। আর এদিকে আমরা নিজেকে গরীব দেশ বলছি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে স্থানে স্থানে Project Reports, Planing Reports, বিভিন্ন প্রকারের Project Valuation এর জন্য consultency Firm কে Contact দেওয়া হচ্ছে। ফলস্বরূপ আগে যেখানে ২০০০ কোটি টাকায় কাজ হ'ত। বর্তমানে সেখানে ঐ সমস্ত C. Firm গুলিতে ২৬০০০ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। এখানের লোকেরা যেখানে সাড়ে ৫ লাখ টাকাতে কাজ করতে প্রস্তুত। সেখানে ২ কোটি টাকাতে কাজ করানো হচ্ছে। আপনারা বিল গেটদের নাম শুনেছেন যে নাকি দান দয়া করতে এসেছিল। ১০০ মিলিয়ন ডলার দিলেন কিসের জন্য এইডস্ (AIDS) রোগের শেষ করার জন্য। ২০০৭ সাল হতে হতে ২ কোটি রোগী হয়ে যাবে। আমাদের বড় বড় নেতারাও বোকা

বনে গেল। শুধু তাই নয় বিল গেটসের মিটিং এ সামনে সারিতে বাসার জায়গা হয় তাই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। বড় বড় রাজ নেতারাও মনে করতে লাগল জীবন সফল হয়ে গেল। আরে ভাই ১০০ ডলার তো দেব খরচ কে করবে।' এক Lingda foundation আছে ওর মাধ্যমে খরচ করব। এ কোন্ সংস্থা? আসলে বিল গেটেসের সাথে যুক্ত আছে। ওরা কি করে? ওর সম্বন্ধ ইংল্যাণ্ডের এক কোম্পানীর সাথে। ওই কোম্পানীর নাম MORC Aids এর ঔষধ তৈরী করে। তো এই ১০ কোটি ডলার দান নয়। এ বিজ্ঞাপনের জন্য বিনিয়োগ এতটাই হলে তো ক্ষমার যোগ্য হত। আগে ইরাকের ব্যাপারে বলল নরসংহারের মারাত্মক অস্ত্র আছে তোমার কাছে। সুরক্ষার দৃষ্টিতে আমার দেশের জন্য বিপজ্জনক। সেজন্য তোমার দেশের পরিসংখ্যান দেখব। U.N.O. বলল আমরা করে দেব কিন্তু আমেরিকা বলল তুমি কবে করবে তার ঠিক নেই আমিই করব। হামলা করল, ধ্বংস করল যদিও সাদ্দাম এমনিতেই স্বৈরাচারীতার জন্য শেষ হ'ত কিন্তু আমেরিকাকে তো ঠিক বলা যাবে না। সব খতম হয়ে গেল কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করুণ মারাত্মক নরসংহার অস্ত্র শস্ত্র কত পাওয়া গেল? পাওয়া গেল না তবে হামলা কিসের জন্য? এর দায়ীত্ব কার? এর জন্য জরিমানা কে দেবে? কেউ আছে জিজ্ঞাসা করার? সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ জিজ্ঞাসা করতে পারেনি? আরে ওতো আমেরিকার দেওয়া টাকায় চলে। অর্থ না দিলে কর্মচারীদের খেতে দিতে পারবে না। আগে ২০০৭ সালে গিয়ে বলবে ২ কোটি সংখ্যা হবে Aids রোগী। এই তথ্য এল কোথা থেকে? National Aids Control Organisation (NACO) আছে এর কাছে পরিসংখ্যান। ১৯৯৯ পর্য্যন্ত কত ছিল? ১৫ লাখ হতে পারে। ১৯৯৮ সালের শেষ হতে হতে ৮১ লাখ হয়ে যাবে বলে আমেরিকান সংস্থা বলেছে। কোথা থেকে পেল জানা গেল খোঁজ খবর করে যে পার্লামেণ্টারি কমিটির কাছে ছিল ৮১ লাখ। এরা কোথা থেকে পেল? এই তথ্য ছিল একটি জাতীয় তথ্যসংস্থা (National Inteligence Council, NIC) নামে Website এ। এরা কোন সংস্থা যেমন আমাদের দেশে 'র'; 'সি.বি.আই' স্টেট ইন্টেলিজেন্স আছে তেমনই আমেরিকাতে এস.বি.আই., সি.আই.এ. প্রভৃতি আরও অন্য প্রকারের তদন্তকারী এজেন্সী সব মিলিয়ে যে সংস্থা তার নাম হল National Inteligence Council (NIC) । এরা যে পরিসংখ্যান দিয়েছিল ঘুরে ফিরে পার্লামেণ্টারি কমিটির কাছে এবং তার থেকেই পুনরায় বলা হয়েছিল। কত প্রকারে কিভাবে কতদূর গভীর চিন্তা করে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে বিপথগামী বিভ্রান্ত করতে কত দূরদৃষ্টিতে এরা চলে। এই উদাহরণ এজন্য দিলাম

কারণ এসমস্ত বিপদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হতে হবে। আমরা ২০০ বছর আগেও যেমন এক নম্বরে ছিলাম আজও আমরা অত গরীব নয়। ওদের সমস্ত পরিসংখ্যান ভুল—যেমন ওরা ভারতকে বলে "তোমরা ১৩৮ তম দেশ", এখন ১২৮ তম হয়ে গেছ। ভিত্তিভূমি কি? ভিত্তি হল GDP of per capita Income যত উৎপাদন হবে লোকসংখ্যার ওপর ভাগ করছে। GDP কোন ভিত্তি হতে পারে নাকি? উদাহরণ—অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলেন ঔষধসহ চিকিৎসা বাবদ যত খরচ হ'ল GDP বেড়ে গেল। নার্সএর খরচ ইত্যাদি নিয়ে অসুস্থতা যত বাড়বে GDP তত বাড়বে। এটা কি বিকাশের লক্ষণ হ'ল? এটা হতে পারে না।

অন্যদিকে বিশ্বে দেশ কত? পুরো বিশ্বে ১৯৪টি দেশ আছে। ভারতের সাথে যদি তুলনা করতে হয় তবে যার জনসংখ্যা কম করে ১০ কোটি তার সাথে তুলনা কর। হাতে গণনা করে বলা যায় (১) জাপান, (২) চীন, (৩) ইন্দোনেশিয়া, (৪) বাংলাদেশ, (৫) ভারত, (৬) পাকিস্তান এই ছয় এশিয়া মহাদেশে। পুরো আফ্রিকাতে এক দেশ (৭) নাইজিরিয়া। পুরো ইউরোপে (৮) রাশিয়া একমাত্র দেশ আমেরিকা মহাদেশে এক (৯) আমেরিকা। পুরো দক্ষিণ আমেকিরাকতে এক দেশ (১০) ব্রাজিল ১৬ কোটি। তাহলে সারা বিশ্বে ১০ কোটির ওপর ১০টি দেশ। ১ কোটির ওপর জনসংখ্যার দেশ ৫৭টি আছে। জার্মানি (৮ $\frac{১}{২}$), ফ্রান্স (৭$\frac{১}{২}$), ইংল্যাণ্ড ৬.৫ কোটি, কানাড়া (৩ কোটি), ভিয়েতনাম ৬ কোটি, মরক্কো ৩ কোটি, পর্তুগাল ১ কোটি আর বাকী দেশ ছোট ছোট। হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড এদের নাম শুনেতো আশ্চর্য হয়ে যাবেন এদের জনসংখ্যা ৪০-৮০ লাখ। তাই এদের সাথে আমাদের কি করে তুলনা হবে?

আরে ভাই এখানে সাধু, মহাত্মা, পূজারী ব্রাহ্মণ এদের সংখ্যাই আমাদের দেশে ৭০ লাখ যাদেরকে রোজ আমরা খাওয়াই। অন্যভাবে দেখি তো ঐ সংখ্যার দেশকে আমরা খাওয়াই তার সাথে আমাদের তুলনা করা হচ্ছে। সেজন্য আমরা তো কমপক্ষে ২০টি দেশের মধ্যে হব। এর থেকে নিচে হবে না। আর আমাদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান নেই। উদাহরণ—পোখরাণ বিস্ফোরণ হয়েছিল—খুবই চেঁচামেচি হ'ল। দেশকে আর্থিক পরাধীন, যুদ্ধ পিপাসু থেকে শুরু করে আরও কি কি বলা হল। অথচ এত বছর হয়ে গেল ঠিকঠাক তো আছি নাকি. কেন ঠিক আছি জানেন—পড়াশুনা জানা লোকেরাও আমাদের দেশকে চেনেনা, তথা জানেই না। রেডার কি করে জানেন বিমান এলে সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে। কিন্তু ওর দুর্বলতা হ'ল ঐ বিমান মাটির থেকে কিছুটা ওপরে উড়লে রেডার ধরতে পারে না। আমাদের

দেশে অর্থনীতির ৫ শতাংশ ওপরে Sensex আছে। Stock Exchange এ লিপ্ত আছে। বাকী ১৫% আছে যা কখনও দেখা যায় কখনও দেখা যায় না, ৮০% শতাংশের অর্থনীতি এমন আছে যা Rader Screen এ আসবেই না। সেজন্য আর্থিক প্রতিবন্ধীর প্রভাব পড়ে নাই। বড় বড় উদ্যোগ , রপ্তানিকার প্রভৃতিদের ওপর পড়েছে—পোখরাণের পর। আর্থিক প্রভাব পড়ে নাই কারণ ভারতের আর্থসামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি রচনাই আলদা।

সরকারের ভূমিকা বিশেষ নাই। আমাদের দেশে চারটি বিচার্য বিষয় কাজ করে—(১) ধর্মসত্ত্বা, (২) সমাজ সত্ত্বা, (৩) অর্থ সত্ত্বা, (৪) রাজসত্ত্বার ভূমিকা ২০% বেশী নয়।

আমাদের দেশ কিভাবে চলে? সঞ্চয়, পরিবার সংস্থার মাধ্যমে দেশ চলে। দান দক্ষিণাতে চলে, কর পদ্ধতি আমাদের কাজে আসে না। উদাহরণ—দুইজন কর্মচারী একই অফিসে কাজ করে—একজনের তিন ছেলে, আরেক জনের তিন মেয়ে যদি থাকে খরচ ছেলেদের চেয়েও মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী হবে কিন্তু Tax Provision কোথায়? ব্যক্তিগত কর পদ্ধতি আছে তো। পরিবার অনুসারে তো লাগু নয়। আমেরিকাতে 40% সামাজিক পরিসেবা কর (Social Welfare Tax)-এ যায়। অসুস্থ, বৃদ্ধ, ছোট বাচ্চা, বেকার, অবিবাহিত বাচ্চা এদের জন্য। আর আমাদের দেশে সামাজিক সুরক্ষার (Social Security) জন্য ৩$\frac{১}{২}$% খরচ হয়। হিলারি ক্লিন্টন এসবকে এনে দিল কিন্তু স্বাস্থ্য পরিসেবা কেন্দ্র (Health Care Unit) চালাতে পারল না। আজও মুশকিলে আছে কিন্তু আমরা তো ঠিক চলছি। ওদের মতো আমাদেরকে চালানোর চেষ্টা করছে WTO বলছে একই প্রকারে চলো। কিন্তু আমরা চলতে পারিনা। ধরুন বৃদ্ধ এদেশে ২০ কোটি আছে। ৬ কোটি তো জনসংখ্যা, এক বৃদ্ধের ১০,০০০ টাকা বছরে সহায়তা ১০ কোটির জন্য ১ লাখ কোটি টাকা লাগবে। ভারতের বাজেট ৮ লাখ কোটি হয় তবে এক বিষয়ে ঐ টাকা দিয়ে দেবে তো বাকী বিষয়ের জন্য বাঁচবে কত? সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও বৃদ্ধলোকেরা বেঁচে আছে। কারণ পরিবারে আছে। ওদের দ্বারা নাতিনাতনীদের দেখাশুনার খরচ যাই হোক GDP তে আসে না। সেজন্য দেশ চলছে। আমাদের দেশ চলার পদ্ধতিই আলাদা। তাই চলছে, তাই বলছি ওদের মতো নয় নিজেদের হিসাবে দেশ চালাতে হবে। যেরকম ইংল্যাণ্ড ভারত একই রকম চলতে পারে কি? ইংল্যাণ্ডে ২ মাস সূর্য্য দেখা যায়না। বৃষ্টি পড়ে, ঠাণ্ডা লাগে, ৬ মাসে একবার ফসল, গম উৎপাদন ৬-৭ মাস লাগে। মুখ্য ভোজন মাংস। এছাড়া পাউরুটি থাকে, বাড়ী-ঘর কি রকম

বানাতে হয় ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগে। ভারতের মতো খোলা মেলা ঘর জানালা হলে নিমুনিয়া হয়ে যাবে। ওদের মতো এখানে বানালে আমরাও মারা পড়ব।

আমাদের স্বদেশী আমাদের জন্য ঠিক ওদের স্বদেশী ওদের জন্য ঠিক। 48⁰C তাপমাত্রায় রাজস্থানে দেখবেন পাগড়ি জামা কাপড়ে শরীর ঢেকে রাখে অথচ ঐ তাপামাত্রায় কেরলে দেখবেন খালি গায়ে ঘুরছে। কেন না রাজস্থানের গরম শুকনো আবহাওয়ার। লু লেগে যাবে। অন্ধ্রপ্রদেশে বিকেলে চায়ের লঙ্কার তেলেভাজা দিল খেলাম কিন্তু মণিপুরে গিয়ে ঐ খেলে ছোট ঘরে আসা যাওয়া শুরু হয়ে যাবে। ভাষা, বেশ, ভোজন, ভজন, ইতিহাস আর ভূগোলের কারণে আলাদা পরিবেশ আবহাওয়া আলাদা হওয়ার ফলে। একজনের নকল অন্যের জন্য লাভদায়ক হয় না। নিজের নিজস্বতাই ঠিক। কিন্তু অন্যের দেখাশুনা মানে স্বদেশী। ওরা চলে ডলারে আমরা চলি ধর্মে। ইন্দোরে গেলাম নামকি 'টাট বালে মামী" মানে ভিক্ষা করে, কারো কাছে ১০ টাকা কারো কাছে ১০০ টাকা, দোকান অনুসারে চায় পরে মন্দিরে যায় কাউকে অভুক্ত দেখলে দান করে বলে নাও ১০ টাকা আবার কোন মহিলার শাড়ী ছেঁড়া দেখলে ১০০ টাকা দান করে দেয়। এরকম করতে করতে সব ভিক্ষা করা অর্থ দান করে আসে নিজে যেমনকে তেমন। সমাজ এভাবে চলে।

ইংল্যাণ্ডে এক প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখলাম "নুড ক্লাবের" উলঙ্গ ছবি গত বছর মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলাতে গিয়েছিলাম কুন্দলপুরে এক জৈন সাধুর সাথে দেখা করতে। নাম বিদ্যাসাগর মুনিজি মহারাজ, উনার আশ্রমে ২০০ জন লোক সবাই উলঙ্গ অবস্থায়। দিগম্বর জৈন সাধু—ওখানে ২০—৪০ বছরের বয়সে সাধুও আছে এই দুই দেশের লোকের প্রেরণার বিরাট তফাৎ আছে। ওখানের ন্যুড ক্লাব ভোগের কারণে এখানের আশ্রমের ন্যুড ক্লাব ত্যাগের প্রতীক। এখানে লোকেরা থাকে নিজের মনের তাগিদে থাকে। বেশী শীত গ্রীষ্ম বর্ষাতেও জামা কাপড় পরে না। একবার খায়, খাটে শোয়, একভাবে ঘুমোও, ঘুম ভাঙ্গলে অন্যপাশ ফিরে শোবে না। পাশ ফিরলে ঘুম ভেঙ্গে গেল উঠে পড়তে হবে ঘুম শেষ। লাখপতির ছেলে কাপড় জামা পরছে না। এই দেশ আলাদা ধরনের ভিন্ন ধরনে চলে জয়ললিতার পালিত পুত্রর বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করে সেই সময় ষ্টেশনে গরীব ছেলেও বিয়ে হয়। যার মনে খারাপ লাগে। কেউ কেউ বলে আগের জীবনের কর্মফল। নিউ ইয়র্কে লোডশেডিং হলে হাজার হাজর বর্ষণ হয়ে যায়। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ কোথায় তাও কিছু হয় না, ওখানে একজনের জন্য ১৩জন পুলিশ। ভারতে দশ হাজারে ১ জন পুলিশ। তা সত্ত্বেও ভারতে ঠিক আছে ৫ লাখ গ্রাম ও ৫০,০০০

পুলিশ থানা আছে। তবুও ভাল চলছে। হাজার হাজার সাধু সন্ত ঘুরছে বলছে। বড়দের শ্রদ্ধা আর চোখের লজ্জা রেখো। তবেই সমাজ চলছে। গোমাতা, সঞ্চয়, দান, দয়া ধর্ম এর নিজস্ব মাহাত্ম্য আছে। আমাদের সমাজ দেশ একরম চলে তাই ২০০ বছর আগেও এক নম্বরে ছিল। বিদেশের নকল আমাদের চলবে না আমাদের স্বদেশী আমাদের জন্য ওদের স্বদেশী ওদের জন্য। তবেই বসুধৈব কুটুম্বকম এর মধ্যে বন্দেমাতরম, ভারতমাতা কী জয়ের সার্থকতা দেখতে পাব। আমার দায় বসুধৈব কুটুম্বকম বানানো আর ওদের কাজ "বসুধৈব বাজারম্" বানানো। আমরাও মোকাবিলা করতে পারি। তাই আর বিশ্বে কোন দেশ নহৈ।

অমারাই করব পারব ৮০ শতাংশের অর্থনীতি স্বদেশীয়ানার মাধ্যমে ভিত শক্ত করে স্বনির্ভরশীলতা (Self Sufficient), স্বচালিকা শক্তি (Self regulated) বানাতে পারলে আর নিজেদের পরম্পরার ওপর যদি চলতে পারি তাহলে ওদেরকে ১০-১২ বছরের মধ্যে নীচে ফেলে আমাদেরকে মান্যতায় আনতে বাধ্য করাতে পারব এই আশা রেখে শেষ করছি।

ধন্যবাদ

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ

প্রস্তাব

(রাষ্ট্রীয় পরিষদ বৈঠক, বোকারো—২৮, ২৯শে জুন, ২০০৩)

মেক্সিকোতে রাষ্ট্র কল্যাণের চিন্তা হোক নতুবা বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন থেকে ভারত ত্যাগপত্রের ঘোষণা করুক

লাগাতার বেড়ে চলা বেরোজগার তথা বেকারত্ব, কৃষির বেহাল অবস্থা এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও কুটির উদ্যোগ বন্ধ হওয়ায় বিশ্বায়ণ ও তথাকথিত আর্থিক বিকাশের আসল মুখোশটি খুলে গেছে। বিকশিত দেশের দ্বারা বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানীর উপকারার্থে এবং বিকাশশীল দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করায় প্রায় সমস্ত বিকশিত দেশে জনাক্রোশ নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্ত স্তরে সরকারের দ্বারা শুরু করা জনবিরোধী আর্থিক নীতির ফলে দেশে এবং বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে বেড়ে চলা বেকারির কারণে আমাদের সামাজিক ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা ঘোষিত প্রতি বছর এক কোটি হিসাবে দশ বছরে দশ কোটি রোজগার যোজনার এখনও পর্যন্ত কোন অগ্রগতি না হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কি! এদিকে আর্থিক সংস্কারে নামে সরকার জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-এর মতো মৌলিক দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ জল বিতরণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ ও বিদেশীকরণের ঘোষণায় এবং গোপন প্রয়াসের কড়া ভাষায় নিন্দা করছে।

কানকুন (মেক্সিকো) থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রীস্তরীয় সম্মেলনে বিকশিত দেশের দ্বারা কৃষি চুক্তি, সরকারি ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগ ও সেবা সম্বন্ধিত বিষয়ের ব্যাপারে বিকাশশীল দেশগুলির ওপর চাপ সৃষ্টিকারী অনেক প্রয়াস হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই ভারতকে গত দোহা সম্মেলনেরর মতো দৃঢ়তা ও নতুন

বিষয় সম্বন্ধীয় বার্তা রোখার আবশ্যকতা আছে। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ সরকারের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়ের দাবি করছে—

(১) মেক্সিকোতে মন্ত্রীস্তরীয় সম্মেলনে যাওয়ার পূর্বে সরকার সংসদে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিষয়ের ওপরে বিস্তারিত আলোচনা করুক এবং সেই গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী সম্মেলনে ভারতের কার্যনীতির নির্ধারণ হোক।

(২) ভারত এক কৃষিনির্ভরশীল দেশ এবং বিকশিত দেশে যেখানে কৃষি শিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়, তার সঙ্গে আমাদের দেশে কৃষির সঙ্গে এর ব্যবসায়ীক প্রতিযোগিতার কোন ঔচিত্য নেই। সেজন্য কৃষি বিষয়কে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চুক্তিপত্র থেকে আলাদা করা হোক।

(৩) আমেরিকা সহ সমস্ত উন্নত দেশ নিজের পরিসেবা ক্ষেত্রে বিকশিত দেশগুলিকে ব্যবসা খোলার প্রস্তাব করেই নি। উপরন্তু নতুন আইন করে এবং নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোগের পরিসেবার ক্ষেত্রে ভারতকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। সেজন্য পরিসেবা সম্বন্ধীয় যেকোন চুক্তির জন্য যেনতেন প্রকারের প্রতিরোধ হোক।

(৪) শ্রমকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ না দিয়ে কেবলমাত্রা পুঁজিকে অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। সরকারি ক্রয় ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে নতুন বিষয় আলোচনা সূচীভুক্ত না করে বিকশিত দেশ দ্বারা অত্যাধিক কৃষি ভর্তুকি, আমাদের দেশ থেকে মাত্রাত্মক প্রতিরোধ (quantitative restriction) তুলে দেওয়া, তথা পেটেন্ট ও অন্যান্য কার্যকরী বিষয়ের ওপর সুচিন্তিত আলোচনা হোক।

সেজন্য সরকারি ক্রয় ও বিনিয়োগ সম্বন্ধীয় তথা বিদেশী কোম্পানীগুলির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবহার সম্বন্ধীয় চুক্তিকে বিকাশশীল দেশের শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় ব্যবহারের সঙ্গে অনিবার্য ভাবে যুক্ত করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও শ্রম মানদণ্ডকে ব্যবসায়ীককরণের কুচক্রান্তকেও একবার পুনরায় অস্বীকার করা হোক।

কেন্দ্র ও প্রদেশ সরকারগুলির জনবিরোধী আর্থিক নীতিগুলির ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দুষ্পরিণাম সম্বন্ধে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের দ্বারা দেশের কোণে কোণে স্বদেশী সংঘর্ষ যাত্রার প্রভাবী প্রচারের ২রা সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে আমাদের দাবির সমর্থনে এক "মহা ধর্ণা" তথা অবস্থানের আয়োজন দিল্লিতে করা হচ্ছে। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ লঘু উদ্যোগপতি, ব্যবসায়ী, উকিল, হিসাব পরীক্ষক, ব্যবসায়ী পরামর্শদাতা, শিক্ষাবিদ, শ্রমিক, কৃষক সহ ধর্ণায় সম্মিলিত হয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবেদন করছে, যাতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আগামী মন্ত্রীস্তরীয় সম্মেলনে ভারতের সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে রাষ্ট্রহিতে পরিণামকারী সুরক্ষা হয়। এই সম্বন্ধে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ নিজের পূর্ব সংকল্পকে স্মরণ করাচ্ছে যে 'যদি সরকার রাষ্ট্র কল্যাণে অসফল হয় তবে দ্রুত বিকশিত দেশের নেতৃত্ব করার জন্য যেন ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা থেকে পদত্যাগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

প্রকাশিত —স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, কেশব ভবন,
৯এ অভেদানন্দ রোড, কোলকাতা-৬